# কুরআন ও সুন্নাহ্

## স্থান-কাল-পরিপ্রেক্ষিত

ড. ত্বাহা জাবির আল্ আলওয়ানী
ড. ইমাদ আল দীন খলিল

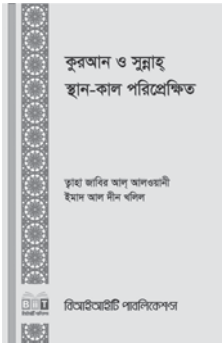


বাংলা অনুবাদ
শেখ এনামুল হক

BiiT
রিআইআইটি পাবলিকেশন্স

কুরআন ও সুন্নাহ্: স্থান-কাল-পরিপ্রেক্ষিত
অনুবাদস্বত্ব © বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
প্রকাশকাল: জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, জুন ২০১৯
প্রকাশক: বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ১২৩০
ফোন: ০২-৫৮৯৫৭৫০৯, ০২-৫৮৯৫৪২৫৬, ০১৭৬৬ ০৭ ৩৩ ২১
ই-মেইল: biitpublications@gmail.com

**মূল্য: ৫০.০০ টাকা**

Tthe Qur'an and the Sunnah: The Time-Space Factor
by Dr. Ṭāhā Jabir al ʿAlwānī & Dr.ʿImād al Dīn Khalīl
Translated by Sheikh Enamul Haque
Published in Bangladesh by BIIT Publications
House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230.
Phone: 02-58957509, 02-58954256, 01766 07 33 21
E-mail: biitpublications@gmail.com

Price: Taka 50.00 only

ISBN: 978-984-8471-68-5

# সূচিপত্র


মুখবন্ধ ৫

প্রথম অধ্যায়

কুরআন: জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস ৭

কুরআনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুন্নাহ্: এর যথাযথ অধ্যয়ন প্রসঙ্গে ৩১

উম্মাহ্র সমস্যা সমাধানে সুন্নাহ্র ভূমিকা ৩৮

সুন্নাহ্র অতি আক্ষরিক ব্যাখ্যার বিপদ ৪০

উম্মাহ্র পুনরুজ্জীবনে সুন্নাহ্র ভূমিকা ৩৯

উপসংহার ৪০

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান: পদ্ধতিবিজ্ঞান সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ ৪১

বিজ্ঞানের দর্শন ও এর লক্ষ্য এবং ইসলামের মৌল নীতিসমূহ ৪৩

পদ্ধতি বিজ্ঞান ৪৬

তথ্য-উপাত্ত ৪৮

প্রয়োগ ৫০

টীকা ৫৫

# মুখবন্ধ

উম্মাহ্‌র শক্তি-সামর্থ্য, বিশুদ্ধতা, জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার মহান দুই উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করা হয়নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজস্ব চৌহদ্দি পেরিয়ে অথবা তাদের বহুমুখী বিষয়ের শুধু দুইএকটি শাখা-প্রশাখায় অতিরিক্ত আলোচনা-পর্যালোচনা করে এ শাশ্বত উৎসের ব্যাপক সম্ভাবনার প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছে। এভাবে উম্মাহ্ তথা সমগ্র বিশ্বকে তার ব্যাপক উপকারিতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

যেহেতু উম্মাহ এখন তার হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ও সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে তার নিজস্ব সমস্যা এবং সুপ্ত ক্ষমতা ও নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষায় ক্রমবর্ধমানভাবে সচেতন, তাই বিষয়টি এখন অধিকতর প্রাসঙ্গিক ও জরুরি। এই দুই উৎসের পুনঃপরিদর্শন এখন আর অতিমাত্রায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ অতীত স্মৃতি রোমন্থন বা পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয় বরং এ হচ্ছে আবিষ্কারের পথে এক মহাযাত্রা- যাতে আছে অজস্র পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি। আর আবিষ্কারের সকল মহাযাত্রার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও আসতে পারে বহুবিধ বাধা ও সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা। তবে দৃঢ় ইচ্ছায় বলীয়ান হয়ে এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হলে এবং মহাপথনির্দেশক এবং সকল পরিব্রাজকের আলোকবর্তিকার রহমত ও করুণার এ অভিযাত্রা থেকে খালি হাতে, বিফল মনোরথে ফিরে আসার কোনো অবকাশ থাকবে না।

বস্তুত এই পুরস্কার পরিমাপযোগ্য নয়। মানুষের সুপ্তশক্তি ও আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার উন্নততর উপলব্ধি; ভারসাম্যপূর্ণ, সক্রিয় ও উদ্দেশ্যমূলক জীবনের পুনরুজ্জীবন, মর্যাদা, শান্তি ও সম্প্রীতির পুনরুদ্ধার শুধু উম্মাহ্‌র নয় বরং সমগ্র বিশ্ব ভ্রান্ত আদর্শ ও ধারণায় বিভ্রান্ত হয়েছে বারবার।

মূলত, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উজ্জ্বলতর অধ্যায়সমূহে অতীতের অভিযাত্রার (গবেষণা ও পর্যালোচনা) মাধ্যমে সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের গতিশীলতা এবং পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং বর্তমান কালের চাহিদা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলমানদের সামর্থ্যকে শাণিত ও প্রাণবন্ত করে তুলবে। এ ক্ষুরধার অভিযাত্রায় সংশ্লিষ্ট মানবিক ও

আপেক্ষিক দিকগুলো শুধু আমাদের মুসলমান ভাইদের মানবজাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর করবে না বরং আমাদের আরো সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে সর্বোচ্চ সফল জীবন ও প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্টিকর্তার কাছে নিয়ে যাবে।

এই গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধে ড. ত্বাহা জাবির আল-আলওয়ানী আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত ও সুরক্ষিত কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটা এমন এক উৎস -যা থেকে যথাযথ মাধ্যমে উপকার পাওয়া যেতে পারে। ড. আলওয়ানী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কুরআন অধ্যয়নের দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম হচ্ছে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ চর্চা সম্পর্কিত আর দ্বিতীয় হচ্ছে খলিফা হিসেবে মানুষকে পৃথিবীতে ইতিবাচক কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে বিশ্বজাহান অধ্যয়নের আহ্বান জানানো সংক্রান্ত। এই উভয় অধ্যয়ন একত্রে সম্পাদন এবং তাদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই হচ্ছে এই পৃথিবী ও পরজগতের কল্যাণ লাভের পূর্বশর্ত।

পূর্বেকার প্রজন্মসমূহ কুরআন ও পরকালের বিভিন্ন দিকের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং নাযিলকৃত ওহিকে ফিকাহ ও আইন কানুনের উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন। কুরআনের এ ধরনের সীমিত অধ্যয়ন বহুকাল ধরে স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে তার উপযোগিতা নিরূপণের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে দমিয়ে রেখেছে। এ নিবন্ধে ড. আলওয়ানী এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে কুরআনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়।

অনুরূপভাবে ড. আল-আলওয়ানীর দ্বিতীয় নিবন্ধ সুন্নাহর সুষ্ঠু অধ্যয়ন থেকে একদিকে যেমন হযরত মুহাম্মদের সা. নবুয়তের লক্ষ্য অনুধাবনে সহায়ক হবে, অপরদিকে তেমনি আমাদের কালের ও স্থানের বাস্তব চাহিদা অনুসারে সুন্নাহ্‌র চেতনার যুক্তিসঙ্গত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

ড. ইমাদ আল দীন খলিল তার নিবন্ধে কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে বলেছেন, কুরআন বিজ্ঞানের কোনো পাঠ্যপুস্তক নয়, তবে এতে সরাসরি বৈজ্ঞানিক তথ্য বা নির্দেশনার আকারে বিজ্ঞানবিষয়ক উপাত্ত (Data) রয়েছে। তাঁর মতে এসব বৈজ্ঞানিক উপাত্ত কাজে লাগানোর জন্য কুরআন একটি নমনীয় ও সার্বিক পদ্ধতি (বিধি) পেশ করেছে–যে পদ্ধতি স্থান ও কালের পরিবর্তনের শিকার হবে না এবং প্রত্যেক যুগ ও পরিবেশে কার্যকর থাকবে।

সর্বোপরি এই গ্রন্থে দু'জন খ্যাতনামা মুসলিম চিন্তাবিদ ড. আল-আলওয়ানী এবং ড. খলিল কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে নতুনভাবে অধ্যয়নের জন্য ইসলামি কাঠামোর আওতায় এসব উৎসের প্রতি সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাদের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন।

ড. এ.এস.আল শেইখ আলী
রশিদ মাসাউদী

**প্রথম অধ্যায়**

# কুরআন: জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস

ড. ত্বাহা জাবির আল-আলওয়ানী

সর্বশেষ ঐশী বাণী ইসলাম হচ্ছে সকল সৃষ্ট জীবের জন্য দয়া, আলো, দিকনির্দেশনা ও ধন্বন্তরী (আরোগ্যস্বরূপ)। আল-কুরআনে উল্লেখ আছে-

> আমরা তোমাকে সকল সৃষ্ট জীবের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি (সুরা আম্বিয়া, ২১: ১০৭)।

এই বাণী ও তার গ্রন্থ কুরআন সর্বদা মানবতাকে নির্দেশনা দিয়ে যাবে এবং সবরকম বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে অটুট থাকবে। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)[১] বলেছেন,

> বাতিল না সামনের দিক হতে না পেছন হতে একে মোকাবেলা করতে পারে। এটা এক মহাজ্ঞানী ও সর্বপ্রশংসিত সত্তার নাযিলকৃত (সুরা হা-মীম আস সাজদাহ, ৪১: ৪২)।

কুরআন হচ্ছে চিরন্তন, চিরবিরাজমান আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং সর্বশেষ নবি (নবিদের মোহর) হযরত মুহাম্মদ সা.[২]-এর মাধ্যমে মানব জাতির প্রতি নাযিল হয় সতর্কবাণী হিসেবে। বস্তুতপক্ষে মুহাম্মদ সা.-এর পরে আর কোনো নবি নেই এবং কুরআনের পরে আর কোনো ওহি আসবে না।

হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নবিদের প্রেরণ করা হতো। প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায়, তাদের উপযোগী করে নবি রসুল প্রেরিত হতেন। নিঃসন্দেহে মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সর্বাধিক খেয়াল রেখে নবিগণ সাড়া দিয়েছেন।

অতীতে এমন কোনো গোত্র বা জাতি ছিল না যাদের প্রতি সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি (সুরা ফাতির, ৩৫: ২৪)।

আমরা রসুল মাত্রই পাঠিয়েছি তাদের স্বজাতির ভাষায়, যেন তারা আমার পয়গাম স্পষ্ট করে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে (সুরা ইবরাহীম, ১৪: ৪)।

ইতোপূর্বেকার নবিদের মিশনে মহাবৈশ্বিক নিদর্শনাদি এবং ভৌতিক মু'জিজা দেখানো হতো। উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে আল্লাহ তায়ালার বাণী মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন নবি তার লোকদের ছায়াদানের জন্য তাদের মাথার ওপর পাহাড় উত্তোলন করতেন, সাগর বিভক্ত করে দিতেন, যাতে দুই জলরাশির মাঝখানে শুকনো রাস্তা দিয়ে তার এলাকার লোকজন চলে যেতে পারে, হাতের ছড়ি নিক্ষেপ করলে তা সর্পে রূপান্তরিত হতো কিংবা পকেটে হাত ঢুকিয়ে পুনরায় বের করে আনলে তা চকমক করত, তবে কোনো ক্ষতি হতো না। আরেক নবিকে এক বিস্ময়কর উষ্ট্রী দেয়া হয়েছিল প্রতীক ও নিদর্শন হিসেবে। তৃতীয় এক নবি মৃতকে জীবিত করতে এবং অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীদের নিরাময় করতে পারতেন। এসব চিহ্ন ও মু'জিজা দেখার পরও জনগণ নবির প্রতি ইমান না আনলে শাস্তি ও ধ্বংসের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেয়া হতো। তবে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহ্‌কে সম্মানিত করেছেন এবং তাদের ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন।

মক্কার কাফেররা যখন মহানবি সা. কে মানুষ হওয়ার জন্য নিন্দা করার পাশাপাশি তাদের জন্য ঝর্নাধারা থেকে সবেগে পানি প্রবাহিত করার, আকাশে মই লাগিয়ে তাতে আরোহণ করার কিংবা স্বর্ণখচিত বাড়ির অধিকারী হওয়ার দাবি জানাল, আল্লাহ তায়ালা তাদের দাবির প্রতি সাড়া দেননি।

এবং তারা বলে, এ কেমন রসুল যে খাবার খায় ও পথে ঘাটে চলাফেরা করে। (অমান্যকারী লোকদের) ভয় দেখানোর জন্য তার নিকট কোনো ফেরেশতা কেন পাঠানো হলো না অথবা তার জন্য কোনো গুপ্তধন কিংবা তার আনন্দ উপভোগের জন্য কোনো বাগান থাকল না কেন? আর এই জালেমরা বলে তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির পেছনে চলতে শুরু করেছ (সুরা ফুরকান, ২৫: ৭-৮)।

আমরা এই কুরআনে সব রকম দৃষ্টান্ত লোকদের ব্যাখ্যা করছি, কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতার সাথে শুধু প্রত্যাখ্যানই করবে (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ৮৯)।

তারা বলল: আমরা তোমার কথা মানব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাদের জন্য জমিনকে দীর্ণ করে একটি ঝর্না প্রবাহিত করে দেবে। কিংবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান রচিত না হবে আর তুমি এতে অজস্র পানির ঝর্নাধারা প্রবাহিত করে না দেবে। অথবা তোমার কথায় আকাশমণ্ডলকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর পড়তে দেবে, যেমন তুমি দাবি করছ। কিংবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সামনাসামনি দাঁড় করাবে। অথবা তোমার জন্য স্বর্ণ খচিত একখানি ঘর নির্মিত হবে কিংবা তুমি আসমানে মই লাগিয়ে আরোহণ করবে। এমনকি তোমার এই আরোহণকেও আমরা বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের ওপর এমন একখানি গ্রন্থ অবতীর্ণ করবে যা আমরা পড়তে পারি। হে মুহাম্মদ! বলো, পাক ও পবিত্র আমার খোদা। আমি বাণীবাহক একজন মানুষ ছাড়া আর তো কেউ নই।

> লোকদের সামনে যখনই হেদায়াত এসেছে তখনই তার প্রতি ইমান আনা হতো তাদের কোনো জিনিস হতে বিরত রাখতে। তা তো তাদের এই কথাটিই: আল্লাহ তায়ালা কি তাহলে (আমাদের মতো একজন) মানুষকে রসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ৮৯-৯৪)।

একই সুরায় কাফেরদের দাবির প্রতি সাড়া না দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে বলেন:

> পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহ মিথ্যা মনে করে অমান্য করায় আমরা নিদর্শন পাঠাতে বিরত থেকেছি। আমরা সামুদ জাতির চোখ খুলে দেয়ার জন্য তাদের প্রতি উষ্ট্রী নাজিল করেছি অথচ তারা তার ওপর জুলুম করল। আমরা তো নিদর্শন এ জন্য পাঠাই যে, লোকেরা তা দেখে সতর্ক হবে (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ৫৯)।

আল্লাহ তায়ালা অবশ্য হযরত মুহাম্মদকে সা.-এর নিকট স্পষ্ট করে দেন যে, সুস্পষ্ট নিদর্শন ও মু'জিজার অভাবেই কাফেররা আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রত্যাখ্যান করেছেন তা নয়, বরং এর রয়েছে অন্যবিধ কারণ। হযরত মুসা আ.[৩] -এর মাধ্যমে মিসরের ফেরাউন ও তার দেশবাসীকে সন্দেহাতীত নিদর্শন ও মু'জিজা দেখানোর পরও তারা মক্কার কাফেরদের অনুরূপ প্রতিক্রিয়াই দেখিয়েছিল।

> আমরা মুসা আ. কে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম। এখন তোমরা স্বয়ং বনী ইসরাঈলের নিকট জিজ্ঞাসা করেই দেখো, যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফেরাউন তাকে বলল: হে মুসা, আমার ধারণা তুমি তো জাদুগ্রস্ত (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ১০১)।

আর আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ সা.-কে নিশ্চিত করে বললেন যে, এই ওহির জন্য তিনি ছাড়া অন্য কোনো নবি অথবা কুরআন ছাড়া অপর কোনো নিদর্শন বা গ্রন্থের প্রয়োজন নেই:

এবং আমি তা (পানি) তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি যেন তারা আমাদের শুকরিয়া করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিমুখ, তারা শুধু অকৃতজ্ঞতাই করে থাকে। স্থায়ী ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদের কেন্দ্রস্থলে একজন করে ভয় প্রদর্শনকারী পাঠাতে পারতাম। অতএব আপনি কাফেরদের কথায় কান দেবেন না বরং এই কুরআন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পরম দৃঢ়তার সাথে জিহাদ করুন (সুরা ফুরকান, ২৫: ৫০-৫২)।

এই সর্বশেষ বার্তা কুরআন অধ্যয়ন, শ্রবণ ও অনুধাবনের ব্যাপারে মানুষকে রাজি করাতে চেয়েছিল যাতে তারা আল্লাহ তায়ালার বক্তব্যের প্রতি ইমান আনতে পারে। যারা আগ্রহের সাথে সত্যের বাণী শুনতে এবং তা প্রত্যক্ষ করতে চায় তাদের মন-মানস ও হৃদয়ের কাঙ্খিত পরিবর্তনের জন্য এটাই যথেষ্ট হবে। তবে যাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত উগ্রতা ও অগভীরতাই ফুটে ওঠে।

তথাপি এই লোকেরা বলে, এই ব্যক্তির ওপর তার আল্লাহর তরফ হতে নিদর্শন নাযিল করা হয় না কেন? বলো, নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহ তায়ালার নিকটই রয়েছে। আমি তো সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী ও সাবধানকারী মাত্র। এই লোকদের জন্য এটাই (এই নিদর্শন) কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা এই লোকদের পড়ে শোনানো হয়? প্রকৃতপক্ষে এতে রয়েছে রহমত ও নসিহত সেই লোকদের জন্য, যারা ইমান আনে (সুরা আনকাবুত, ২৯: ৫০-৫১)।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) তাঁর প্রজ্ঞাবলে অধ্যয়নকে এই উম্মাহর জীবনে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় বানিয়েছেন। হযরত জিবরাঈল আ. কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ওপর নাযিলকৃত প্রথম শব্দ হচ্ছে ইকরা (পড়)। উত্তরে নিরক্ষর নবি বললেন, আমি তো পড়তে পারি না। এরপর ফেরেশতা তাঁকে আল্লাহ তায়ালার আদেশ (বাণী) শোনালেন:

পড় (হে নবি)! তোমার আল্লাহর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্তের এক পিণ্ড হতে। পড়, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞানদান করেছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না (সুরা আলাক, ৯৬: ১-৫)।

যে প্রক্রিয়ায় নবি করিম সা. ওহি পেতেন, তার শুরুর এই আয়াতগুলোতে[৪] দুটি নির্দেশ রয়েছে যার প্রত্যেকটিতে একটি ঐশী ও একটি মানবিক দিক রয়েছে।

প্রথম নির্দেশ হচ্ছে পড়তে হবে; অর্থাৎ নাযিলকৃত ওহি গ্রহণ, অনুধাবন ও তা ঘোষণা করতে হবে। কুরআন যে আল্লাহ তায়ালার কালাম ও ওহি এবং তিনিই তাঁর নবির কাছে এটা নাযিল করেছেন যাতে করে তা মানুষের কাছে সম্পূর্ণরূপে ও গ্রহণযোগ্য আকারে পৌঁছে দেয়া যায় এই নির্দেশের মধ্যে ঐশী দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। আর মানুষের কাছে প্রত্যাশিত যে, তারা এর ওপর চিন্তা করবে, মনে রাখবে, অনুধাবন করবে ও অব্যাহতভাবে শিখবে।

> কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমার প্রতি তার ওহি সম্পূর্ণ হয়। বরং বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো জ্ঞান দান করো (সুরা ত্বাহা, ২০: ১১৪)।
>
> আমরা এই কুরআন অনুধাবন করাকে সহজ করে দিয়েছি। তাহলে এ থেকে উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত কেউ আছে কি? (সুরা ক্বামার, ৫৪: ১৭)।
>
> (হে নবি!) এই ওহিকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়াবে না। এ বাণী সংরক্ষণ ও তেলাওয়াত করানোর দায়িত্ব আমার (সুরা কিয়ামাহ, ৭৫: ১৬-১৭)।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালার দায়িত্ব হচ্ছে নাযিল করা, প্রেরণ করা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা, আর মানুষের কাজ হচ্ছে পড়া, শিক্ষালাভ করা এবং শিক্ষাদান করা যাতে মানুষের রূহ পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হতে পারে। শুধু তার পক্ষে তারা খলিফা হিসেবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের এবং সভ্যতা নির্মাণে এবং মানব জাতির জন্য উত্থিত কিছু উত্তম মানুষ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, যা তাদের হাতে দেয়া হয়েছে কাজে লাগাতে পারে:

> তিনিই (আল্লাহ) যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে থেকে তাদেরই একজনকে পাঠিয়েছেন রসুলরূপে: যিনি আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে (সুরা জুমআ, ৬২: ২)।

অধ্যয়ন সম্পর্কিত দ্বিতীয় তাকিদে মানব সমাজকে বিশ্বজাহান পর্যবেক্ষণ এবং তার মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ এবং বহুমুখী গঠন উপকরণের অর্থ অনুধাবনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা এবং ঘোষণা করা যে, এসবই নিয়ন্ত্রক আল্লাহ তায়ালা এবং এগুলোতে তাঁর তাওহিদের প্রকাশ সুস্পষ্ট। বস্তুত খোদ মানুষসহ সকল সৃষ্টিতে খোদায়ী বিষয় পরিস্ফুট। [তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু জমাটবাঁধা রক্ত থেকে (সুরা আলাক, ৯৬: ২)।] জমাটবাঁধা রক্ত থেকে মানুষ এবং জীবন ও মৃত্যুর

মধ্যকার সম্পর্ক এবং এ পর্যায়গুলোর সাথে এই সুশৃঙ্খল বিশ্বজাহানে ক্রিয়াশীল ঐশী শক্তির অন্যান্য চিহ্ন মিলে যায়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে জ্ঞানার্জনে এবং সভ্যতা নিদর্শন বিকাশের উপযোগী করে তৈরি করা। এটা আল্লাহ তায়ালার রহমতের সুস্পষ্ট প্রমাণ যার মহিমা সকল কণ্ঠ ও ভাষায় বিঘোষিত।

> পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা তাঁর প্রশংসা/স্তুতি করে না (সুরা ইসরাঈল, ১৭: ৪৪)। অপর উদ্দেশ্যটি হচ্ছে অস্তিত্বের লক্ষ্য এবং সৃষ্টির প্রজ্ঞা অনুধাবন।
>
> তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে তোমাদের স্থিতি দান করেছেন (সুরা হূদ, ১১: ৬১)।
>
> আমি মানুষ এবং জিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি (সুরা আয যারিয়াত, ৫১: ৫৬)।

এই দু'রকম অধ্যয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, যা একই সাথে ঘটতে হবে এবং তা হতে হবে আল্লাহ তায়ালার নামে। তদুপরি তাদের আন্তঃসম্পর্ক আল্লাহ তায়ালা ও মানুষের মধ্যে একটি যোগসূত্র সৃষ্টি করে এবং এটা নিশ্চিত করে যে, খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে কর্তব্য পালনকালে এবং মহাবিচারকালে তিনি তার সঙ্গী হন। এবং তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন (সুরা হাদীদ, ৫৭: ৪)। আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি এতই রহম দিল যে, তিনি এই দুই অবস্থাতে কোনোটিতেই মানুষকে একা ছেড়ে দেন না। বরঞ্চ, আল্লাহর কালাম পাঠের মধ্য দিয়েই, তিনি মানুষকে দিকনির্দেশনা দান করেন:

> পড় এবং তোমার প্রভুই হচ্ছে অতীব করুণাময়। তিনি তোমাদের কলমের ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষ যা জানত না তা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন (সুরা আলাক, ৯৬: ৩-৫)।

তিনি জানেন মানুষের দুর্বলতা, তার সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা, তার জ্ঞানের দৈন্যতা আর চিন্তার আপেক্ষিকতা।

> তিনিই যে স্রষ্টা তা কি সে জানে না? তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যসমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ভালোভাবেই অবগত (সুরা মুলক, ৬৭: ১৪)।
>
> কারণ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল প্রকৃতি দিয়ে (সুরা আন নেসা, ৪: ২৮)। আর (হে মানুষ) জ্ঞানের অত্যন্ত সামান্য অংশই তোমাদের অবহিত করা হয়েছে (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ৮৫)।

আল্লাহ তায়ালা এভাবেই আদমকে আ. সব কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন কলমের মাধ্যমে এবং মানুষ যা জানত না তাও শিক্ষা দিলেন এ উদ্দেশ্যে

মানুষ যেন তার প্রথম পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারে। তিনি সব কিছুকেই তার অনুগত করে দিলেন, তাকে বিশ্বময় পরিভ্রমণের আদেশ দিলেন এবং তাকে পর্যবেক্ষণ, চিন্তন ও অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলি দান করলেন আর নিদর্শনাদিকে তাঁর কাছে উন্মুক্ত করে দিলেন যাতে সে দ্বিতীয় পাঠে উদ্যোগী হতে পারে।

একই সঙ্গে এই দুই পাঠের সম্মিলন হচ্ছে এই বিশ্ব এবং পরজগতের কল্যাণের পূর্বশর্ত। এই দুই পাঠের যে কোনো একটির পরিত্যাগ অথবা অবহেলা প্রদর্শন অথবা তাদের মধ্যকার ভারসাম্যহীনতা ঘটানোর অর্থই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কালাম থেকে দূরে চলে যাওয়া। এ ধরনের কার্যকারণের দুঃখজনক পরিণতি হচ্ছে দুনিয়ার জীবনকে কঠিন ও সঙ্কটময় করে তোলা এবং পরকালীন জীবনকেও মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করা।

> যারাই আমার বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদের জীবন হবে সঙ্কীর্ণ এবং কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাব (সুরা ত্বাহা, ২০: ১২৪)।

এ অবস্থায় মানুষ খলিফা এবং সাক্ষ্যদাতা হিসেবে তার অবস্থান থেকে বিচ্যুত হবে এবং তাকে অপমান ও দাসত্বের জীবন বরণ করতে হবে।

> যারা খোদাকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা দুনিয়া উপভোগ করবে বটে, তবে তারা খাবে গবাদিপশুর মতো। আর দোযখ হবে তাদের বাসস্থান (সুরা মুহাম্মদ, ৪৭: ১২)।

> তারা তো গবাদিপশুর মতোই-বরং তদপেক্ষা বিভ্রান্ত; কারণ, তারা (হুঁশিয়ারি থেকে) একেবারেই বেপরোয়া (সুরা আরাফ, ৭: ১৭৯)।

দ্বিতীয় পাঠের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দিয়ে প্রথম পাঠ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটির ফলে পাঠক অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ও চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হতে পারে যা তার ধারণা ও চেতনার ক্ষেত্রে অনেক উপকারী হতে পারে। অবশ্য, একই সাথে এটা তাকে এক ধরনের আধ্যাত্মিক স্থবিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং খলিফা ও প্রশিক্ষকের ভূমিকায় তার প্রয়োজন এবং দায়িত্বের সাথে অসম্পৃক্ত বিষয়ে আত্মলীন হতে পারে। এটা সীমিত পরিমাণে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মেনে নেয়া যেতে পারে বা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে তবে উম্মাহ্‌র বিস্তৃত পর্যায়ে যদি এটা ঘটে অথবা তার জীবন বিধানের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া হয় তাহলে তা হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ এর ফলে মানবিক মূল্যবোধের ধারণা অবহেলিত এবং প্রত্যাখ্যাত হবে। পরিণামে কোনো ব্যক্তি জীবন দর্শনের এবং বিশ্বে তার অস্তিত্বের

জন্য মানুষ হিসেবে যে ভূমিকা, তার প্রতি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে। এটা তখন এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যে, সে পৃথিবীতে তার অস্তিত্বকেই বোঝা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং কেয়ামতের সাফল্যের প্রত্যাশায় চরম কৃচ্ছতার মধ্যে এ জীবনের দায়িত্বাদি থেকে অব্যাহতি নেয়ার চেষ্টা করবে।

## কুরআনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআন আলাদা আলাদা অংশে নাযিল হয়েছে। নাযিলের সময় জনগণের হৃদয় ও মন-মানস যাতে তা গ্রহণ, অনুধাবন এবং চিন্তা-ভাবনা করতে পারে সে জন্য বিশেষ পরিস্থিতি ও পরিবেশ উপলক্ষে এটা নাযিল হয়েছে। এর ফলে জনসাধারণ তা বুঝতে পারত এবং তাদের হৃদয়-মনে কুরআনের শব্দ, অর্থ, আদেশ ও নির্দেশ স্থায়ীভাবে গেঁথে নিত। এরপর তাদের হৃদয় তা গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত হতো, তাদের মন-মানস এগুলো অনুধাবন করত এবং তাদের মানসিকতা হতো উন্নত। সামগ্রিক জীবন এতে সাড়া দিত এবং তা সন্তুষ্টি এবং পবিত্রতার জীবনে রূপান্তরিত হতো। পবিত্র কুরআন এভাবে প্রথম প্রজন্ম এবং পরবর্তী প্রজন্মসমূহের জন্য একটি দিকনির্দেশনা, একটি প্রমাণ ও একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে পারে।

> তারা বলে, এই ব্যক্তির ওপর সমস্ত কুরআন একই সময়ে নাযিল হয় না কেন? কুরআন এমন এক পদ্ধতিতে নাযিল করা হয়েছে যেন, আমরা তা দ্বারা তোমাদের অন্তরকে শক্তিশালী করতে পারি, আর সে কারণে আমরা উহাকে ধীরে ধীরে এক সুবিন্যস্ত ধারায় ক্রমান্বয়ে তোমাদের ওপর অর্পণ করেছি (সুরা ফুরকান, ২৫: ৩২)।
>
> আর এই কুরআন আমরা অল্প অল্প অংশে বিভক্ত করে নাযিল করেছি-যেন তুমি থেকে থেকে তা লোকদের তেলাওয়াত করে শোনাও আমরাও কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ১০৬)।

পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে একটি চ্যালেঞ্জ ও মু'জিজা হিসেবে, যা মানুষের হৃদয়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করত, ফলে তার আত্মা হতো আলোকিত। এভাবে আল্লাহর বাণী গ্রহণ করার পথ হতো উন্মুক্ত এবং তারা দেহ-মন উজাড় করে দিয়ে তা গ্রহণ করত।

পবিত্র কুরআনে প্রত্যেক স্থান ও কালের এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল মানুষের উপযোগী মৌলিক ধারণা, সাধারণ বিধি, নির্দেশনা এবং উপদেশ রয়েছে। যদি

নাযিল হওয়ার সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছোটখাটো ঘটনা ও সমস্যা নিয়ে এতে আলোচনা করা হতো তাহলে সময় ও কালের সার্বজনীনতার অনন্য বৈশিষ্ট্য তার থাকতো না এবং পরবর্তী যুগের মানুষ তাতে দেখতে পেত ব্যাপক অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা। যেসব বিশেষ সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে সেগুলো প্রত্যেক কালের পরিস্থিতির সাথে অনিবার্যভাবে একই প্রকৃতির ও বিধির এবং পূর্ববর্তী গোষ্ঠী ও মানুষের ইবাদত, উত্তরাধিকার ও ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের ওয়াদা করে বলেছেন,

> আমরা নিঃসন্দেহে কুরআন নাযিল করেছি এবং নিশ্চিতভাবে আমরাই (বিকৃতি থেকে) রক্ষা করব (সুরা হিজর, ১৫: ৯)।

কুরআনকে তার মূল ভাষায় সংরক্ষণের (এবং অর্থ বা ব্যাখ্যা হিসেবে একে আরবিতে প্রচারের নিষেধ) পেছনে উদ্দেশ্য ছিল এটা নিশ্চিত করা যে, আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির জন্য যেরূপ জীবন পদ্ধতি পছন্দ করেছেন তা প্রতিষ্ঠা করতে যেন এ গ্রন্থটি (সর্বকালে) সক্ষম থাকে। কোটি কোটি মুসলমান পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার সময় যেসব শব্দে ও আকারে ছিল-সেভাবেই পড়ছে ও তেলাওয়াত করছে। এর ফলে মুসলমানদের মত ও পথ যত রকমের হোক না কেন সকল কালের এবং সকল দেশের মুসলমানরা কুরআনকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয়, এটা আল্লাহ তায়ালার এক বিস্ময়কর কুদরত। এ জন্য মহানবি হযরত মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর সাহাবি ও নেতৃস্থানীয় ফকিহ্‌গণ[৫] দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, কুরআনের প্রত্যেকটি অক্ষর মানুষের মননে প্রথমে গেঁথে রাখতে হবে, এরপর লিখে রাখা হবে। একই ধারা মহানবির সা. সাহাবিদের পক্ষ হতে অনুসরণ করা হয়েছে বলে তাবেয়িগণ (সাহাবিদের পরবর্তী প্রজন্ম) জানিয়েছেন। সাহাবিগণ পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্য কোনো কিছু লিখে রাখা নিষিদ্ধ মনে করতেন। অন্যান্য বিষয় বাস্তব প্রয়োগ সংক্রান্ত এবং তা ছিল তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে। ধর্মীয় অথবা অন্য কোনো মূল গ্রন্থের বেলায় এ ধরনের অবস্থা কখনো ঘটেনি।

কুরআনের অর্থ সম্পর্কে বলা যায়, মহানবি সা. প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা করার জ্ঞান রাখতেন। তবে তিনি তা করতেন না। হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার নবি হযরত জিবরাঈল আ. মারফত শিক্ষা পেয়ে অল্প কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। এসব আয়াত গায়েব (অদৃশ্য) সম্পর্কিত এবং এমন আরো কিছু বিষয় যা শুধু ওহির মাধ্যমেই জানা সম্ভব। ফলে কুরআনের তাফসির ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা নানা পথে কুরআন গবেষণা করে বেড়িয়েছেন। তাদের কেউ কেউ সফল হয়েছেন, কেউ বা হননি। মহানবির সা. সাহাবিগণ ওহি নাযিল হওয়া প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নাযিল হওয়ার কারণ, নাসিখ এবং মানসুখ[৬] আয়াত এবং এসব আয়াতের সাথে

সম্পর্কিত কারণ জানতেন। ইমাম গাজ্জালী রহ. এবং ইমাম কারতুবী রহ. বলেছেন:

সাহাবিগণ তাফসির সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন তা সবই রসুলে করিম সা. থেকে এসেছে–এ কথা মনে করা দুটো কারণে ভুল। এর একটা হচ্ছে মুহাম্মাদ সা. অল্পসংখ্যক আয়াতেরই তাফসির করেছেন। হযরত আয়েশা রা. এরূপ মত পোষণ করেন। অপর কারণটি হচ্ছে, তারা স্বয়ং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের তাফসিরে ভিন্ন মত পোষণ করেছে যার সমন্বয় সাধন করা হয়নি এবং মহানবি সা. থেকে যার সব কিছু ব্যাখ্যা করা হয়নি, যদিও অনেকেই এরূপ করে থাকতে পারেন[৭]।

এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআনের সীমিত জ্ঞানের মধ্যে মেধা বা মনন আবদ্ধ হয়ে পড়া উচিত নয়, এতে কুরআনের অর্থ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিংবা কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রজন্মের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়ে।

বস্তুত কোনো মুসলমানের পক্ষে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে কুরআন অধ্যয়ন এবং সাথে সাথে তার আয়াত ও অর্থ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। এর বিপরীতক্রমে অনুধাবন ছাড়া পাঠ বা অধ্যয়ন সমর্থনযোগ্য নয়। ফকিহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, অনুধাবন ও অনুধ্যান সহকারে অল্প পরিমাণ পড়া ও চিন্তা-ভাবনা করা অনুধ্যান ছাড়া বেশি পড়ার চাইতে উত্তম। এখানে অনুধ্যান বলতে আমরা বুঝি আয়াতের আবৃত্তি করা, পর্যালোচনা করা, এর অন্তর্নিহিত সকল অর্থ জানার লক্ষ্যে আলোচ্য অংশের বিশদ আলোচনা করা এবং মেধাবী ও বুদ্ধিবৃত্তির মননশীল লোকদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে অন্তর্নিহিত অর্থ সাজিয়ে রেখেছেন তাতে পৌঁছার ব্যাপারে অবাধ ও অব্যাহত চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দান।

ঐশী গ্রন্থ হিসেবে পবিত্র কুরআন হচ্ছে সর্বপ্রকার জ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র এবং মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞানের পণ্ডিতদের জন্য একটি বিশুদ্ধ নির্দেশিকা। এতে সাধারণ বৈজ্ঞানিক সূত্র এবং নির্দেশনা রয়েছে, যা মানুষের বৈজ্ঞানিক স্পৃহাকে জাগ্রত এবং পরিচালিত করে। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে বহু মুসলমান দীর্ঘদিন ধরে এই ধারণা পোষণ করে আসছেন যে, পবিত্র কুরআন হচ্ছে মূলত বিভিন্ন জাতির অতীত ইতিহাসের একটি সূত্র। এর কাহিনিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে হুঁশিয়ারি বাণী হিসেবে, এছাড়া কেয়ামত এবং অদৃশ্য বিষয় ও ফিকাহ্র[৮] খুঁটিনাটি বিধিবিধান সম্পর্কে এটা একটা তথ্যের ভাণ্ডার।

তারা এর কবিত্বপূর্ণ ভাষা, স্টাইল (Style) এবং আরবি ভাষায় ওজস্বিনী ছন্দ ও ভাষাগত সৌকর্যের অনুকরণীয় দিকের জাদুকরী সৃজনশীলতার ব্যাপারেই বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া আরবি ভাষার আওতায় থেকে ইতোপূর্বে অজ্ঞাত আরবি স্টাইলের মোহনীয় শক্তিশালী রচনাশৈলীর ওপরও মনোযোগ নিবদ্ধ